International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No. 24-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.24-31

নারীত্বের পরাভব ও অপমানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র ছোটগল্প

চন্দন বিশ্বাস
স্কলার, আরকেডিএফ ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, এবং অনুষদ, ড. বি.আর আম্বেদকর সাতবারশিকি

Abstract:

In the post-Renaissance period, the time of extreme development of the capitalist society, the life of modern man became multidimensional and infinitely complex. In the era of modern human consciousness, in many cases inconsistencies and disasters, heartaches, human values, hope-desires are wounded. The characters of short stories were created in the 19th century based on the stories of such human society. Later, as the pressure of the internal narrowness of capitalist civilization increased, as people became mechanized by the rule of time, the development of the short story was stunted. As a result, besides creating numerous short stories, we were introduced to many such characters, which appeared bright from the point of view of personality. With the mental world of these characters, the novelty of their outlook on life and the world caught us. In fact Rabindranath Tagore is one of the personalities of Bengali short stories. In the 19th century, it was through his hands that we were introduced to the true short story. The way in which the short story has progressed or is still progressing in Bengali literature is definitely according to the path shown by Rabindranath. Just as "Gitbitan" is the object of love for Bengalis, every story of Rabindranath is very popular with everyone. Each story in the collection makes us think and inspire. Rabindranath's equal and no one else have found such a significant place in Bengali literature. Judging by the subject matter, Rabindranath has included almost all subjects in his story. Regarding the story of Rabindranath, the thing that has attracted our attention the most is the different characters in the story of Rabindranath. Even more remarkable is the self-glorification of women in Indian literature. With the change in the context of time in the evolving trend, we notice that women are deprived, neglected, humiliated everywhere in the society. Rabindranath was outraged by the scenes of injustice towards women and developed protest through his writings. In the course of analysis, it becomes true that the female characters in Rabindra's short stories are much brighter, stronger, significant and resonant than the male characters. The dilemma-doubt, silence-failure of women developed in the water and air of Bangladesh has once ended in loud or silent protest. Rabindra's short story against the lack and humiliation of femininity, in the context of the discussion, we will be searching for it.

Keynotes: Introduction/Argument neutral formal/Silent protest/Self-awakening of women/Self-expression/Decisive decision/Conclusion

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা। সাহিত্যিকদের নামে যুগের নাম বিশ্বসাহিত্যে বিরল, সেখানে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগ আজও জাজ্বল্যমান। রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যাকাশে দীপ্তি ছড়াচ্ছেন তখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উন্মেষ ঘটে। সে সময় ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা ছিল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও জমিদারী শাসন ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। আর এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। সমাজ জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল সুগভীর। সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে উঠে এসেছে নারী হৃদয়ের সুক্ষ বা স্পষ্ট প্রগতি ভাবনা। নারী কোথাও নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে আবার কোথাও নীরবতার মধ্য দিয়েই সামাজিক অত্যাচার অনুশাসন না মানার ভাবনাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমাজের গভীরে প্রবেশ না করলে নারীর এরকম বিচিত্র ভাবনা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত বিভিন্ন ছোটগল্পে নারীর প্রগতিশীল ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে শুধু শোষিত ও অত্যাচারিত হতে হয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ছিল শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র --- সম্মান, শিক্ষাদীক্ষা তখন দূর অস্ত।নারীর প্রতি সমাজের অবিচারে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বারে বারে। তাঁর অনেক রচনাতেই সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারীর প্রতি কবির মনোভাব সমালোচকের কলমে ধরা পড়েছে এইভাবে - “কবি দেখিয়েছেন ব্যক্তি বিশেষ যখন মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখনও সেই ব্যক্তি বিশেষ তার জন্য একা দায়ী নয়। তার উপরে প্রভাব ফেলে সমস্ত সমাজের মনোভাব। নারীকে অপমান করতে, অবজ্ঞা করতে সমস্ত সমাজ তার সমর্থন জানাচ্ছে পুরুষকে। এই জন্যই যেখানে পুরুষ নারীকে আন্তরিক ভালোও বাসে, সেখানেও সে অনায়াসে নারীকে অপমান করতে পারে। এমনি করে আমাদের দেশের মেয়েদের অপমান করাটা যেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বভাবগত হ’য়ে উঠেছে। এর কারণ এরকম অপমানে সমাজ কোন প্রতিবাদ করে না।”[১]

রবীন্দ্রনাথের ‘ঘাটের কথা’ গল্পটি গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প। গল্পশিল্পী রূপে রবীন্দ্রনাথের আদি সৃষ্টি। তবে ছোটগল্পের শিল্পরীতি বিচারে এই গল্প যথেষ্ট চর্চিত। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের আদি-সমালোচক সুখরঞ্জন রায় বলেছেন, ‘ঘাটের কথা’ ‘লিরিক ও ছোটগল্পের সীমান্ত দেশের রচনা’, ‘ছোটগল্পের স্ফুটগৌরবে’ অপ্রকাশিত। পরবর্তীকালে এর সমালোচনাসূত্রেকেউ এটিকে বলেছেন ‘গল্পচিত্র’, কেউ বলেছেন ‘গল্পভাস’, আবার কেউ বলেছেন ‘উপাখ্যান’। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ এখানে লক্ষ্য করেছেন ‘বাক্-প্রগলভতা’।[২] গল্পটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ জানিয়েছেন, “কুসুমের জীবনকথায় ঘাটের ভাষা বিবৃতিমুখ্য না হয়ে হয়ে উঠেছে সংকেতমুখ্য। কুসুমের জীবনের যেটুকু অংশ ঘাটের ইন্দ্রিয়গোচর শুধু সেটুকুই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই খণ্ডাংশের মধ্যেই দেখা দিয়েছে একটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা। কুসুমের বাল্য থেকে যৌবনে পদার্পণে, বিবাহ, বৈধব্য ও একাকীত্বের মধ্যে সময়ের প্রলম্বিত গতিবেগ অনুক্ত না থাকলেও অনুভূত হয়নি”।[৩] রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পে পণপ্রথার ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এই গল্পে পণপ্রথার নিষ্ঠুরতম শিকার নিরুপমার বাবা রামসুন্দর মিত্রের ধারণা ছিল তাঁর অসামান্য সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য যোগ্য পাত্র রায়বাহাদুরের একমাত্র চাকুরিরত পুত্র। কিন্তু বিয়ের

সময় 'যোগ্য' পণ জোগাড় হল না। আর এরই ভয়াবহ পরিণতি আমরা গল্পে দেখতে পাব। গল্পে আমরা দেখি গরীব পিতা তার অতি আদরের একমাত্র মেয়ে নীরুর সম্বন্ধ করলেন রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে৷ কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে পিতা বিবাহের পূর্বে পণের টাকার হিসাব করলেন না। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না বিবাহের নির্দিষ্ট সময়ের আগে। বর জেদ ধরায় বিয়ে তো হয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখি বধূর যথাযোগ্য সম্মান বা আদর নীরু পায় না শ্বশুরবাড়িতে। বধূর প্রতি শাশুড়ীর এক নির্মম উদাসীনতা ছিল। বধূর পিতাও যেন অপরাধী থেকে যায় কন্যার শ্বশুরবাড়িতে। একসময় নিজের অনধিকার প্রবেশের লজ্জায় নীরু খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় এবং অবশেষে মারাও যায়। তখন শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের অনুরূপ তার সৎকার এবং শ্রাদ্ধের কার্যাদি হয়। আমাদের সমাজে যেমন বধূর কোন মূল্য নেই, তেমনই যেন তাঁর মৃত্যুও সমাজের কাছে কোন গুরুতর ক্ষতি নয়। বিবাহের পর তার ব্যক্তিত্ব পিতার মর্যাদা সবকিছুই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে পণের টাকার জন্য। শেষ পর্যন্ত সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একক নারী কণ্ঠে ঘোষণা করেছে 'আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আমার দাম'। কিন্তু তার এই প্রতিবাদ যথার্থ মর্যাদা পায় না। তাই আত্মহননের মধ্য দিয়েই বেছে নিয়েছে তার পথ। তবে নিরুপমা বাহ্যিক প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে না পারলেও টাকা 'যদি দাও তবেই অপমান'--- নিজের অপমানের বোধটুকু তৈরি করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি সমাজের অন্যায়-অবিচারের ছবি এঁকেছেন 'দান-প্রতিদান' গল্পেও। 'বিচারক' গল্পে নারীর প্রতি সমাজের অবিচারের বিচারাসনে বসে কবি রায় দিয়েছেন কাপুরুষতার বিপক্ষে। সমাজের চোখে অপরাধিনী নারীকে গভীর সমবেদনার সঙ্গে নির্দোষ বলেই অভিমত দিয়েছেন।

পোস্টমাস্টার গল্পটির মধ্যে এক গ্রাম্য বালিকার মানবিক হৃদয়াকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। "নদী তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্বজনসঙ্গচ্যুত, পারিবারিক স্নেহ মমতার জন্য ক্ষুধিত এক তরুণ পোস্টমাস্টারের শহীদ অনথা পল্লীবালিকা রতনের এক ক্ষণস্থায়ী, করুণ সম্পর্কের উদ্ভব"।[৪] রতনের বয়স তখন বারো-তেরো -- আমরা জানতে পারি তার আর বিয়ে হবে না। কারণ সে যে সমাজে বাস করে সেখানে মেয়েদের দশবছরের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এর কারণ আচরিত ধর্ম কুসংস্কার। সামাজিক অনুশাসনের দিকটা ধরে বিবেচনা করলে 'দেনা পাওনা'র নিরুপমার পরই গল্পগুচ্ছে বর্ণিত পোস্টমাস্টারের রতনও এই অনুশাসনের বলি। কলকাতার এক নব্য যুবক নিতান্ত দায়ে পড়ে উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টার হয়ে এসেছে। অজ পাড়াগাঁয়ে মানসিক অবলম্বনহীন সেই যুবকের দায়িত্ব নিল পিতৃমাতৃহীন ত্রয়োদশী যুবতী রতন। কিছুদিনের মধ্যেই রতন হয়ে উঠলো একাধারে সেবা-কারিনী পরিচারিকা, ভগিনী ও জননী। রোগশয্যাশায়িত পোস্টমাস্টারের স্নেহবুভুক্ষুমেটাতে গিয়ে রতন তাকে ভালোবেসে ফেলল। কিন্তু তার দাদাবাবু সেই ভালোবাসা অনুধাবন করতে পারল না। শেষে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে জীবনের চরম দার্শনিক সত্য 'পৃথিবীতে কে কাহার'।

'স্ত্রীরপত্রে'- মৃণালকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি নির্দিষ্ট যুগের যাবতীয় অসারতার প্রতিসৃয়মান ছায়াস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেননি। মৃণালের উত্তরণ যথাযথভাবে বিশ শতকীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিসত্তার এক অসাধারণ উন্মোচন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই গল্পে মৃণালের জীবন পিতৃতন্ত্রের প্রবল সংস্কার ও নিয়মের শাসনেই পীড়িত হয়েছে। মাত্র বারো বছর বয়সে শহরের রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারে তার বিবাহ হয়। মৃণালকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন পছন্দ করেন শুধুমাত্র রূপের কারণে। কিন্তু মৃণাল রূপ নয়, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সংসার চালাতে চেয়েছে। আর তখনই শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে পদে পদে মৃণালের সংঘাত

বেঁধেছে। মৃণালের চিঠিতে প্রতিবাদের ভাষায় আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত দোষত্রুটি উঠে এসেছে। মৃণাল সংসারের সব নিয়মকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারেনি। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ ছিল প্রবল। বড়জায়ের প্রতিকূল মানসিকতার জন্য মৃণাল প্রতিনিয়ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। হয়তো এ ভাবেই বাদ প্রতিবাদের মাধ্যমে একদিন তার জীবন অভ্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু তাদের সংসারে বড়জায়ের বোন বিন্দুর আগমন মৃণালের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অনাথা, অর্থহীনা, কুরূপা বিন্দুর আগমনে সকলেই দুশ্চিন্তায় পড়লো এবং তাকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান অসম্মান করতে লাগলো। নিজের দিদিই বিন্দুকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করল। বিন্দুর এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করতে নিজের শেষ শক্তি দিয়ে মৃণাল চেষ্টা করে। কিন্তু বিন্দুর বিয়ে আটকাতে পারে না। বিন্দুর বিয়ে হয়ে যায় এক পাগল স্বামীর সঙ্গে।বিন্দু আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় মৃণালের নারীত্ব প্রতিবাদে গর্জে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের অপর সৃষ্টি 'সুভা' ও 'মহামায়া'।গল্পদুটি সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন – "সুভা' (মাঘ, ১২৯৯) ও 'মহামায়া'(ফাল্গুন, ১২৯৯) এই দুইটি গল্পে বাক্‌শক্তিহীনা সুভা মূক প্রকৃতির সহিত এক বৃহৎ একাত্মতায় লগ্ন হইয়া নিজ ব্যক্তি সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে ও প্রকৃতি তন্ময়তার সাঙ্কেতিক গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার গ্রাম্য পরিবেশকে যতদূর সম্ভব সমবেদনাহীন ও তাহার শুভাশুভের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনরূপে দেখান হইয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার বিবাহ সারিয়া নির্দায় হইতেই ব্যস্ত ও তাহার স্বামী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করে নাই। তাহার অন্তর- সৌকুমার্যের সহিত তাহার মানবিক পরিবেশ একেবারেই নিঃসম্পর্ক এবং এই উপায়েই এই পেলব সত্তাটির বাস্তবতা রক্ষিত হইয়াছে"।[৫] অপরদিকে 'মহামায়া' গল্পটি প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন – "মহামায়া চরিত্রের বিদ্যুতদীপ্তি বাঙলা দেশের সদ্যো অতীত ও দীর্ঘকাল- প্রচলিত কৌলীন্যমেঘবিচ্ছুরিত। তাহার মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত বিবাহের আয়োজন; তাহার সতীদাহের জন্য তাহার একমাত্র অভিভাবক দাদার অনমনীয় দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহার চিতা হইতে পলায়ন ও কঠোর শর্তাধীনে রাজীবলোচনের সহিত বাস করিতে সম্মতি ও এই শর্তভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান – সমস্তই প্রমাণ করে এই দীপ্ত রূপের পিছনে কতটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কঠোর উপাদান সঞ্চিত ছিল। তাহার চরিত্রে বিদ্যুতের সহিত বজ্রঅব্যবহিত নৈকট্যে মিশ্রিত ছিল ও কুলীন কন্যার প্রচণ্ড কুলাভিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজ্রস্তনিত নিঃস্বনেই আত্মপ্রকাশকরিত"।[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পেও নারীর ওপর পীড়ন এসেছে বিবাহোত্তর জীবনে। 'শাস্তি' গল্পে কৃষিজীবী দরিদ্র পরিবারে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। এই গল্পে একইসঙ্গে উঠে এসেছে শারীরিক ও মানসিক পীড়নের চিত্র। এ গল্পে রাধাকে হত্যা করা হয় এবং চন্দরার ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাপিয়ে দিয়েছিল সেই হত্যার দায়। চন্দরা তার ফাঁসির আগে একবার শুধু তার মা'কে দেখতে চেয়েছিল, স্বামীকে নয়। স্বামীর নাম তার সামনে করলে সে শুধু বলেছিল 'মরণ'। এই 'মরণ' শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও মানসিকতার প্রতি তার ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও চপেটাঘাত। 'মানভঞ্জন' (১৩০২) গল্পে দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। 'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা গিরিবালা আত্মহত্যা করেনি, বরং যে কারণের জন্য তার প্রতি অত্যাচার নেমে এসেছে সেই কারণ সে অনুসন্ধান করে। অবশেষে জানতে পারে থিয়েটারের অভিনেত্রীর প্রতি প্রেমাসক্তির জন্যই তার স্বামী আর তার সঙ্গে থাকতে চায় না। এক্ষেত্রে জোর করায় তার প্রতি নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। প্রতিবাদস্বরূপ গিরিবালা অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে।

উনিশ শতকে নতুন আলো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সচেতন পুরুষের যেমন জন্ম হয়েছিল, তেমনি জন্ম হয়েছিল সচেতন নারীরও। প্রত্যেকের হয়ত প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তৈরী হচ্ছিল শিক্ষিত রুচিশীল মন। যেমন 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকে আমরা দেখি শহর থেকে গ্রামে আসা নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের একমাত্র সঙ্গী ও আশ্রয় হয়ে উঠেছিল সো রতন একাধারে পালন করেছিল বন্ধুর ভূমিকা, গৃহরক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকা, আহারের যোগানদাত্রী ও সেবিকার ভূমিকাও। 'একরাত্রি' গল্পের নায়িকা সুরবালা পাঠশালায় পড়ত। সুরবালার বিবাহ পরবর্তী জীবনে একই গ্রামে নায়কের আবির্ভাব এবং সুরবালারই স্বামী উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনার সময়ে পাশের কক্ষে সুরবালার যে উপস্থিতি সেখানে নায়কের প্রতি বাতায়নবর্তিনীর কৌতূহলী চোখ যেমন আছে, তেমনি হয়ত শিক্ষিত রুচিশীল মনের স্মৃতির চিত্রও নেপথ্যে কাজ করেছে। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীও যে পড়াশুনা শিখেছিলেন তার উল্লেখ আছে গল্পে। যদিও মৃন্ময়ীর চিঠিতে বাঁকা লাইন, অক্ষর সুছাঁদ পায়নি এবং শুদ্ধ বানান হয়নি তবুও সেই সময়ের একটি নারী যে স্বামীকে পত্র লিখছে এটি উঠে এসেছে। সেই সময়ের এক নারীর আবেগবিহ্বল অসম্পূর্ণ মনের অসচেতন প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রে, যা গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের গিরিবালার মধ্যে যে পড়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল তা ধরা পড়েছে যখন সে আপন ঘরে বসে দাদাদের মত বই নিয়ে পড়ার ভাণ করে ও বইয়ের পাতা ওল্টায়। 'আখ্যানমঞ্জরী'র দিকে তার নীরবে তাকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে লেখক গিরিবালার মনের ইচ্ছেকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশেষে স্বামী শশীভূষণের কাছে তার পাঠগ্রহণ শুরু হয় এবং শশীভূষণ অনেক কাব্যের তর্জমা শুনিয়েও গিরিবালার মতামত জানতে চাইতেন। অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক মত আদান-প্রদানের আধুনিক রীতির দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারীর স্বাধীন-স্বতন্ত্র ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তার স্ফূরণকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'অধ্যাপক' গল্পে পুরুষের তুলনায় নারীর বিদ্যা বা মেধার শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু এখানে নারী তার শ্রেষ্ঠত্বকে লোকসমাজে প্রচারিত হতে দিতে চায় না। গল্পের নায়িকা কিরণ প্রগতিশীল নারীর যথার্থ শিক্ষিতা রূপ, যারা যুগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। 'খাতা' গল্পের নায়িকা অল্পবয়সী উমাকে আমরা দেখেছি যে সে লিখতে ভালবাসে। ঘরের দেওয়ালে কয়লা দিয়ে আঁকা বাঁকা লাইন কেটে বড় বড় অক্ষরে সে লিখে চলে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'।

রবীন্দ্রনাথ 'হৈমন্তী' লিখেছেন সবুজপত্র পত্রিকার ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়।পূর্ববর্তী যতগুলি ছোটগল্পের সংসার ক্ষেত্রে নারী সত্তার উন্মোচন ঘটেছিল তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রগুলি খুব সূক্ষভাবে নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যাবে যে কালগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বৈশিষ্ট্যগত ধারায় ব্যক্তিসত্তার বিকাশলাভের পর্যায়গুলির একপ্রকার ধারাবাহিক ক্রম রয়েছে।এই ক্রমের অন্তর্গত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি গল্প হল – 'হৈমন্তী' এবং 'স্ত্রীরপত্র'।'হৈমন্তী' গল্পের কথক অর্থাৎ হৈমন্তীর স্বামীর বয়ানে গল্প আরম্ভ হচ্ছে এবং আরম্ভে কথককে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ হৃদয়ের অকৃত্রিম একজন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।হৈমন্তী পাহাড়ের কন্যা, উমার ন্যায় তার সারল্য, উমার ন্যায়ই তার সত্যদর্শন, স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টবাদী।হৈমন্তীর পিতা রাজসংসারে চাকরি করেন। ব্যাংকে যে তাঁর কত টাকা, সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অঙ্কপাত করেছে, কিন্তু কোন অংকটাই লাখের নিচে নামেনি।এর ফল হয়েছিল এই যে, তার পিতার দর যেমন যেমন বাড়ল, হৈমর আদরও তেমন তেমন বাড়তে থাকলো।ধনতন্ত্রের কি ভয়াবহ রূঢ়

বহিঃপ্রকাশ! কিন্তু হৈমর আদরও দিনে দিনে কমতে আরম্ভ করল, যখন জানা গেল তার পিতা, কোন রকম পুঁজির মালিকতো ননই, মেয়ের বিয়েতে যে পনের হাজার টাকা নগদ ও পাঁচ হাজার টাকার গহনা তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রায় সাড়ে আট আনাই ধার করে তাকে জোগাড় করতে হয়েছে।এর আগে বারংবার আমরা দেখেছি পন না দিতে পারার কারণে রবীন্দ্র ছোটোগল্পের বিভিন্ন নারীদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। হৈমন্তীর ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা যেন আরো এক পর্যায়ে অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথ কোথাও উল্লেখ করেননা হৈমন্তীর মৃত্যুর কথা, হৈমন্তী যেন ফুরিয়ে যায়, নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে একদিন কেবল ফুরিয়ে যায় হৈমন্তী। হৈমন্তীর মুখের হাসিটুকুও ফুরিয়ে যায়। তারপরে কি যে হল। সেকথা আর বলতে পারলেননা কথক, কারণ কথক নিজেও জানেন যে - তার রক্তে যে বহু যুগের শিক্ষা আছে, সেই শিক্ষা তাকে করে তুলেছে সীতা বিসর্জনের নির্মম প্রথার উত্তরসূরী। সেই শিক্ষা সত্যধর্মকে লোক ধর্মের কাছে বিসর্জন দেওয়ার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ভীষণ প্রত্যক্ষ ভাবেই হৈমন্তীতে লোকধর্ম ও সমাজ ধর্মের যাবতীয় অসারতাকে সুস্পষ্ট রূপদান করেছেন সমাজধর্মের যাবতীয় অন্তঃসারশূন্যতার কাছে ব্যক্তিসত্তার যথার্থ বিকাশ যে কেবলমাত্র চোখের ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়, সে কথা ভীষণ স্পষ্টভাবেই উঠে আসে হৈমন্তীর মধ্যে দিয়ে। হৈমন্তী যেন এক বিমূর্ত কতগুলি অবিনশ্বর ধারণার মানবিক প্রতিমূর্তি হিসাবে দেখতে ইচ্ছা হয়। সে কারণেই বোধহয় হৈমন্তীর মৃত্যু হয়েছে একথা স্বীকার করতে ইচ্ছে করেনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কবিতার এই দুটি পংক্তি যেন হৈমন্তীর ধারণাকে পাঠকের অন্তরে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে - "হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবার মুহুর্তের পরমাযু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা"। হ্যাঁ হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবারই বটে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবার নয়।কবিতার দীর্ঘ ব্যাপী অনুরণনটুকু নিয়েই হৈমন্তী যেন বিশ শতকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের লোক দেখানো আড়ম্বরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ত:সারশূন্যতার ছায়া স্বরূপ হয়ে রয়ে যায়।

নারীর ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন ও আত্মপ্রকাশের অন্যতম একটি রবীন্দ্র-গল্প 'নষ্টনীড়'। গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন - "এ গল্পের নায়িকা চারু লিখতে চেয়েছিল, কল্পিত প্রতিপক্ষের তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ — এই বোধ - থেকে"।[৮] গল্পে যদিও চারুর লেখিকা হবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু সে লেখাপড়া জানত বলে 'ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠাই তার একমাত্র কাজ বলে মনে করেছিল। চারু লিখত গোপনে শুধুমাত্র অমলের জন্যই, স্বামী ভূপতিকে সে তার লেখা দেখাতে চায়নি। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি ভূপতির কোন দৃষ্টি ছিল না, সে ব্যস্ত ছিল 'ভারত সরকারের সীমান্ত নীতি' নিয়ে। তবে পরবর্তীকালে বিপর্যস্ত ভূপতি চারুকে জয় করার জন্য, চারুকে পাবার জন্য চারুর সঙ্গে লেখালেখি করে চারুকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। অপরদিকে 'দর্পহরণ' গল্পে উনিশ শতকের নারীর লেখিকা সত্তা ও বধূ সত্তার দ্বন্দ্বের চরমতম প্রকাশ। গল্পটি লেখা হয়েছে বক্তার উত্তম পুরুষে। গল্পের নায়িকা নির্বারিণীর স্বামী তার স্ত্রীর প্রতিভাকে স্বীকার করেন না। স্ত্রীর লেখা যখন প্রত্যেকে ছাপাতে চায় তখন নায়ক পড়ে অসুবিধায়। স্ত্রীর পরিচয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিতে লজ্জিত হন, তার অহংবোধে আঘাত লাগে। অপরদিকে 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের দীপালি শিক্ষিকা। সে স্বাধীনভাবে বাঁচার কথা ভাবে। 'প্রগতিসংহারে'র নায়িকার মত পুরুষের জন্য নয়, দীপালির প্রেমে নিজস্বভাবে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি স্পষ্ট।

ল্যাবরেটরি' গল্পে রয়েছে নারীর স্বাধীন বিকাশশীল মনের ছবি। স্বামীর সঙ্গে 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনীর মিল ছিল কর্মজগতের একাত্মতায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপর দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'অনধিকার প্রবেশ (১৩০১) 'বলাই' (১৩৩৫)। গল্পদুটি প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন - "এ গল্প দুটিতে কিন্তু

একজন নারী প্রগতিবাদী হয়েছে, বা আলোকপ্রাপ্তা হয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র ফুটে ওঠেনি সমগ্রতায়, কিন্তু একটি ঘটনায় তার বৈশিষ্ট্যের স্বরূপটি চিহ্নিত হয়েছে। যেমন 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী স্বতন্ত্র, প্রতিবাদী ছিল কিন্তু সে প্রতিবাদে সামাজিক আলোক চিহ্নিত হয়নি, শূকরছানাকে রক্ষার মাধ্যমে জয়কালীর প্রতিবাদ, চিরকালীন মানব-শক্তির রূপের জয়গান গাওয়া হয়েছে। অসহায় প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে জয়কালী আর 'বলাই' গল্পে রয়েছে নারীর বৃক্ষোচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ"।[৭]

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম অত্যাচার, অপমান, অবহেলা, বঞ্চনা, উদাসীনতার শিকার ছিল যে নারীরা তারা ক্রমশই রবীন্দ্র-গল্পে হয়ে উঠেছে আলোকপ্রাপ্তা - নিজের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করেছে। এই নারীরাই আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'কালান্তর' গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন সভ্যতার আবির্ভাব ঘোষণা করে বলেছিলেন – "অতি দীর্ঘকাল মানব-সভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। ..... মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে উঠেছিল এক ঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে, সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয় ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়েছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিল।"[৮] এভাবেই রবীন্দ্র-গল্পের নারীরা পরাভব ও অপমানের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীদের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বের দরবারে বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর ভূমিকাকে কালজয়ী রূপ দান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বিদ্যান্ত লীলা, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী', অভী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৮, পৃঃ-৩।
২. দাশ শিশিরকুমার, 'বাংলা ছোটগল্প', প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃঃ- ৮৯।
৩. ঘোষ তপোব্রত, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃঃ- ১৮।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৭৮, পৃঃ- ৩৩৯-৩৪০।
৫. তদেব- পৃঃ-৩২৭।
৬. বসুহক ড. নবনীতা, 'রবীন্দ্র গল্পে নারীর সামাজিক বিবর্তন',এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৯ জুলাই ২০১১, পৃঃ-৩৮০।
৭. তদেব, পৃঃ-৪৩৭।
৮. ঘোষ তপোব্রত, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০,পৃঃ-৩৮২।